প্রথম আলো
অনলাইন সংস্করণ

বন্ধ করুন প্রিন্ট করুন

ঢাকা, রোববার, ৬ জুলাই ২০০৮, ২২ আষাঢ় ১৪১৫, ২ রজব ১৪২৯
বর্ষ ১০, সংখ্যা ২৩৯, আপডেট : বাংলাদেশ রাত ১টা ৫৫ মিনিট

সি ড নি থে কে

প্রবাসে এ যুগের ফটিকদের কথা

অজয় দাশগুপ্ত

রবীন্দ্রনাথের ফটিক বাঙালির জীবনে এক অবিস্মরণীয় চরিত্র। বয়ঃসন্ধির কষ্ট, দুঃখ, যন্ত্রণা ও আনন্দ-বেদনার প্রতীক এই ফটিক কি কেবল বারো, তেরোতেই সীমাবদ্ধ? যুগ পাল্টেছে, ফটিকের বয়সও এক জায়গায় স্থির থাকেনি। 'ঘর হতে আঙ্গিনা বিদেশ'-এর কালে গড়ে ওঠা নব্য ফটিকদের জীবন, জীবনযুদ্ধ মানুষ হয়ে ওঠার জন্য নতুনভাবে দেখার ও বলার সময় এসেছে। এখন মামাবাড়ি যাত্রাতে সীমাবদ্ধ নয় এদের জগৎ। মায়া, ভালোবাসা, নিসর্গে অনুপম হওয়ার পরও আমাদের দেশটি দারিদ্র্যের অভিশাপমুক্ত রাজনীতি তাকে ক্রমাগত দুর্বল আর উত্তেজনাপ্রবণ করে রেখেছিল। এখনো তা প্রবহমান। এমন অনিশ্চিত সমাজ আর সংঘাতপূর্ণ জীবন থেকে নিশ্চিত নিরাপদ ভুবনে পাড়ি দেওয়া ফটিকদের কষ্ট বা মনোজগৎ বারো-তেরোর সীমানা ছাড়িয়েছে অনেক আগেই, যা পৌঁছে গেছে কুড়ির কোঠায়।

তারুণ্যে ঘরছাড়া, দেশ পাড়ি দেওয়া বাংলাদেশের নতুন ফটিকদের কথা ও কাহিনী হতে পারে আনন্দ-বেদনার নতুন অধ্যায়। সম্পূর্ণ নতুন ভুবনে পাড়ি দেওয়া তরুণ-তরুণীর জীবন আরব্য রজনীর গল্পের মতো রোমাঞ্চকর ও বর্ণাঢ্য, যদিও আমাদের দেশের মতো বিমানবন্দর বা জীবনের সর্বক্ষেত্রে ভোগান্তি নেই। পা দেওয়ার পর থেকেই তরতর করে চলতে থাকে জীবন। যেসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী হয়ে এরা আসে, তারাই আগ বাড়িয়ে অপেক্ষা করে। বিমানবন্দরে প্ল্যাকার্ড নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা থেকে থাকার জায়গা পর্যন্ত ঠিক করে দেয়। আনুষ্ঠানিকতায় বাহুল্য নেই, নেই কোনো ঝুট-ঝামেলা। যতক্ষণ পর্যন্ত নগদ কড়ি, ততক্ষণই সব ঠিকঠাক। এই যে নগদ নারায়ণ, সেটা কি আর গরিব দেশ থেকে সম্পূর্ণ নিয়ে আসা সম্ভব? সে কপাল সবার হয় না, দু-চারজন ব্যতীত বাদ-বাকিরা মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান। তারা শিক্ষার সন্ধানে উচ্চশিক্ষা অর্জনে বিদেশে পাড়ি দেয় বটে, সঙ্গে থাকে জীবন গঠনের স্বপ্ন। কোনোভাবে এক-দুই সেমিস্টার বা পুরো কোর্সের টাকাটা জোগাড় করতেই হিমশিম খায় তাদের অভিভাবক– কেউ জমি বিক্রি করে, কেউ ধার-দেনা করে, কেউ কেউ নিঃশেষ করে দেয় পেনশন বা বার্ধক্যের শেষ সঞ্চয়। লক্ষ্য একটাই, সন্তান যেন থাকে দুধে-ভাতে।

এই তারুণ্য ইউরোপ, আমেরিকার পর এখন মূলত অস্ট্রেলিয়া বা কানাডাগামী। অস্ট্রেলিয়ায় যারা আসে, তাদের জীবনকে কাছ থেকে দেখার সুযোগ ঘটে। তাদের অনেকেই কালক্রমে হয়ে উঠেছে পরিবারের কেউ। ফলে নির্দ্বিধায় বলতে পারি, তাদের জীবন একমুখী সরল বা সুখের কিছু নয়। ওই যে বলছিলাম নিম্নবিত্ত বা মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে আগত, সে চাপটা বইতে হয় দীর্ঘদিন। ডলারের বিনিময় হার বেশি বলে উপার্জন করে পিতৃঋণ বা মায়ের দেনা শোধ করতে ঝাঁপিয়ে পড়ে। এই ঝাঁপিয়ে পড়াটা আক্ষরিক অর্থে যেমন, তেমনি কাজেও। ফেয়ার ট্রিটমেন্ট বলতে যা বোঝায় তার বেলায় শৈথিল্য নেই এ দেশে। কিন্তু পরিশ্রমটাও 'ফেয়ার' গোছেরই। শুরুতে কাজ খুঁজতে থাকা শিক্ষার্থীদের ভাগ্যে শিকে ছেঁড়াটা সহজ কিছু নয়। বিদ্যা এখানে মৌলিক বিষয়, উচ্চ স্বরে ব্যবহারের সার্টিফিকেট মূলত মূল্যহীন। তাই প্রয়োজনীয় শর্ত একটাই, অভিজ্ঞতা। অভিজ্ঞতা থাকলে ম্যানেজার থেকে চাপরাশি যেকোনো কাজ পাওয়া সম্ভব। কিন্তু অভিজ্ঞতা বা ওয়ার্ক এক্সপেরিয়েন্সটা আসবে কোথা থেকে? বাড়িতে যে কোনো দিন এক গ্লাস পানি গড়িয়ে খায়নি, সে-ই তখন নেমে পড়ে রেস্তোরাঁর টেবিলে টেবিলে খানাপিনা ও পানির জোগানে। হেন কাজ নেই যা আমাদের তরুণ-তরুণীরা করছে না, তা করার মধ্যে বিন্দুমাত্র অসম্মান বা মর্যাদাহীনতা নেই। বরং যত পরিশ্রম তত টাকা, ততই সচ্ছলতা। কিন্তু নিয়মের বাইরে পা ফেলে তো আর উপার্জন করা যাবে না। যারা তা করে, ধরা পড়লে পত্র পাঠ বিদায় ও ভোগান্তি। নির্ধারিত সীমাবদ্ধ সময়মাফিক কাজে এখানকার জীবন এবং দেশে অর্থ জোগানো চাট্টিখানি কথা নয়। তাদের বেলায় ব্যাপারটা কিঞ্চিৎ সহজ, যাদের আছে বউ বা স্বামী, চলতি ভাষায় স্পাউস, তাদের জন্য নিয়ম শিথিল, তারা করতে পারে ফুলটাইম কাজ। তবু অর্থ মূল সমস্যা নয়। ডলার উড়ছেই। তবে হাত বাড়ালে চোরাপথে বা হাওয়ায় মিলবে না বটে। সে জন্য ঠিক জায়গায় পা ফেলা দরকার। তা ছাড়া উদ্বৃত্ত বাজেটের, কল্যাণমুখী রাষ্ট্র বলে কথা! শিক্ষার্থী বা অভিবাসী অথবা বেকার যা-ই হও না কেন, তুমি না খেয়ে মরবে? সরকার রয়েছে কী জন্য?

ফটিকরা তাই অর্থচিন্তা বা বই হারানোর দুঃস্বপ্নে ভোগে না। ভোগে ঠিকমতো পড়াশোনা শেষ করার তাগিদে। একেকটা পরীক্ষা পাস, কয়েক হাজার ডলারের সাশ্রয়। ফেল করলে মামি বা শিক্ষক কেউই তেড়ে আসবেন না। বরং কোথাও একটা নীরব প্রশ্রয় যেন লুকিয়ে, 'তাতে কী হে বৎস! ফেলো কড়ি, মাখো তেল, একবার না পারিলে...।' এই চাপটা শিক্ষাজীবনের দুর্বিষহ অধ্যায়, তাও সামাল দিচ্ছে তারা, মনোযোগ, লাইব্রেরিওয়ার্ক, সম্মিলিত মেধা বিনিময়ে পাস করে বেরিয়ে যাচ্ছে।

একটা বিষয়েই কেবল মীমাংসা নেই। গ্রামের মাঠে ঘুড়ি ওড়ানোর শখ। দলবেঁধে হইহই করে সাঁতার কাটার স্মৃতি ফটিককে তোলপাড় করে তুলবে। তার চিন্তায় ছিল ফেলে আসা ছোট্ট একটি গ্রাম। তাদের মগজে, মেধা ও রক্তে পুরো একটি দেশ, ভাষা ও সংস্কৃতি, প্রযুক্তির কল্যাণে দেশে সকাল হওয়ার আগেই অস্ট্রেলিয়ায় থেকে বাংলাদেশের খবরের কাগজ পড়তে পারা যায়। অন্য মিডিয়াগুলোও সচল। সবচেয়ে দ্রুতগামী মিডিয়া যে মন, সে তো সময় বা সীমানা কোনোটাই মানে না। চোখের সামনে ভেসে বেড়ায় একুশের প্রভাতফেরি, বৈশাখের বটমূল, রমনার আড্ডা বা চলমান সংস্কৃতি। তাই বৈপরিত্য বা অন্য ভাষা ও সংস্কৃতির সমাজের সঙ্গে মন মিলতে চায় না তাদের। হাজার হোক নিজের দেশ বলে কথা।

সিডনির নয়নাভিরাম নিসর্গ, মেলবোর্নের আভিজাত্য, ব্রিসবেনের রৌদ্রমুখরিত আবহাওয়া, কিছুই যেন কিছু নয়। ক্যাফে, বার, কফি, রেস্তোরাঁ, অলিম্পিক মাঠ, ঘোড়দৌড়, অস্ট্রেলীয় সংস্কৃতি ভালো লাগে বটে, টানে না। তবে কি এরা মূলস্রোত থেকে বিচ্যুত? মোটেই তা নয়। ৫০ বটে, ৭০ বছর ধরে বসবাসরত গ্রিক, ইতালিয়ান ইংরেজরা কী করছে? নিজেদের বলয় বা সংস্কৃতির ভেতর থেকে তারপর অস্ট্রেলীয়, তারপর এই বহুজাতিক সমাজের নাগরিক। আমাদের সন্তানেরাও একদিন তা-ই করবে। একদিকে দেশ ও দেশজ ঐতিহ্য, অন্য প্রান্তে এ দেশের মূলধারা–দুয়ের মধ্যে গড়ে তুলবে সেতুবন্ধন। সে উদারতা বা আবহ এ সমাজের আছে এবং তা পরীক্ষিত। 'এক বাঁও মেলে না, দুই বাঁও মেলে'–এই দোটানায় জীবন কাটানোর চেয়ে সে সেতুবন্ধনই জরুরি।

অজয় দাশগুপ্ত: অস্ট্রেলিয়া প্রবাসী লেখক।

desguptaajoy@hotmail.com

URL : http://www.prothom-alo.com/print.php?t=m&nid=MTA2OTAw বন্ধ করুন | প্রিন্ট করুন

Home | About Us | Feedback | Contact

Best viewed at 1024 x 768 pixels and IE 5.5 & 6

Editor : Matiur Rahman, Published by : Mahfuz Anam, 52 Motijheel C/A , Dhaka-1000.
News, Editorial and Commercial Office: CA Bhaban, 100 Kazi Nazrul Islam Avenue, Karwan Bazar, Dhaka-1215.
Phone: (PABX) 8802-8110081, 8802-8115307-10, Fax: 8802-9130496, E-mail : info@prothom-alo.com

Copyright 2005, All rights reserved by **Prothom-Alo.com**

Privacy Policy | Terms & Conditions